

আরবানায় রবীন্দ্রনাথ

সুদীপ বসু

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/3_Sudip-Basu.pdf

সারসংক্ষেপ: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন আরবানায় গিয়েছিলেন এবং কেনই-বা আরবানায় নিভৃতবাসের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন হেতু বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আরবানার অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরবানা, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষিবিজ্ঞান, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়।

১

‘এলেম নতুন দেশে’

আরবানায় প্রথমবার

১৯১২র ১ নভেম্বর একটি বৃষ্টিভেজা দিন। সেদিনই রবীন্দ্রনাথ ইলিনয় রাজ্যের আরবানায় প্রথমবার পা দিলেন। সঙ্গী ছিলেন ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। ১৯ অক্টোবর ১৯১২এ লন্ডন থেকে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্কে পৌঁছেছিলেন ২৭ অক্টোবর। হেরাল্ড স্কোয়ার হোটেলে চারদিন কাটিয়ে ১৯১২র ১ নভেম্বর থেকে ১৯১৩র ১৯ মার্চ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সব মিলিয়ে চার মাস উনিশ দিন আরবানা শহরের বাসিন্দা ছিলেন।^১ একটানা আড়াই মাসের নিভৃতবাসের পরে^২ খ্যাতির বিড়ম্বনায় আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ শিকাগো, রচেস্টার, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণমূলক ভাষণ দিলেন। কিন্তু বালমলে শহরে আসা-যাওয়ার মধ্যেও তাঁর নিভৃতবাসটিকে রবীন্দ্রনাথ ভালেন নি। বারবার ফিরে এসেছিলেন আরবানার ভাড়াবাড়িতে। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে সেকথা স্মরণ করিয়ে গর্বের সুরে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি এবং অধ্যাপক-গবেষক হ্যারল্ড এম হারউইটজ বলেছেন,

But of all the American cities that Tagore visited during his trips to the United States in none did he stay longer or make more friends than he did in Urbana, Illinois... His many friends in Champaign-Urbana are wormed by the thought that if any city in America was Tagore's home it was their community.^৩

আরবানায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম কয়েকদিন তাঁর পূর্ব পরিচিত এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক মরগ্যান ব্রুকসের বাড়িতে এবং রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ছাত্রদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. এ আর সেমুরের বাড়িতে অতিথি ছিলেন। তারপর ৫০৮ ডব্লু হাই স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে সবাই চলে এলেন। ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখলেন, “আমরা একটা আস্ত বাড়ি এক বছরের মত ভাড়া নিয়েছি।”^৪

রবীন্দ্রনাথ কেন আরবানায় গেলেন এবং কেনই-বা আরবানায় নিভৃতবাসের এক বছর পূর্ণ হবার আগেই লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। আপাতভাবে দেখা যাচ্ছে, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিজ্ঞানে পিএইচডি করার জন্য আরবানায় এসে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন যদিও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক বেটসনের অধীনে কাজ শুরু করার কথা প্রথমে স্থির হয়েছিল।^৫ সম্ভবত পুরনো বিদ্যায়তন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথের দুর্বলতা এর কারণ। সুতরাং পুত্রস্নেহে রবীন্দ্রনাথ এখানে আসবেন সেটাই স্বাভাবিক। সেকথা জানিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’ বইতে লিখেছেন, “বাবাকে খুব করে বলাতে শীতের মরসুমটা আমার পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ইলিনয় জেলার আর্বানা শহরে যাপন করতে বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আশা ছিল যে এই সুযোগে হয়তো বা ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা করতে পারব।”^৬

অন্য কারণ উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘদিন ক্রমাগত পরিশ্রম এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি তখন নিরতিশয় ক্লান্ত। তাঁর শরীর এবং মন চাইছিল নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম। তাই রবীন্দ্রনাথের মুখে আরবানা-শ্যাম্পেনের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ এখানে আসতে আগ্রহী হন। সেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি চিঠির পর চিঠিতে সেকথা জানিয়েছেন উইলিয়াম রোটেনস্টাইন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীরা দেবী, জগদানন্দ রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখকে। আরবানায় রবীন্দ্রনাথের সহচর সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাও পরবর্তীকালে সেইসব দিনের কথা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লিখেছিলেন ‘রবীন্দ্র-সঙ্গামে যুরোপ-প্রবাসের স্মৃতি-কথা’।

৩১ অক্টোবর আরবানা যাবার ঠিক আগের দিন রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনকে চিঠি লিখলেন: “Off we go to the west – to Illinois. I hope I shall get rest there for which I long.”^৭ আর ৭ নভেম্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠি, “আমরা এখন যে শহরে আছি এটি ছোটখাটো জায়গা — একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেষ্টিত করে প্রধানতঃ অধ্যাপক ও ছাত্ররাই এখানে বাস করেন — সেইজন্য বেশ নিরিবিলি — আমার ঠিক মনের মতো জায়গা। আর একটি মস্ত সুবিধা এই যে ইংলন্ডে শীতকালটা যে রকম অন্ধকারে কুয়াশায় আচ্ছন্ন এখানে সেরকম নয় — যথেষ্ট শীত বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সূর্যের আলো।”^৮ আরবানা-শ্যাম্পেনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লাভের কথা সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে বলার সময় রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে আবেগও ছিল, “আমার এখানে বেশ মন বসেছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই — আকাশ খোলা আলো অপরিাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকা এসেছি — ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি। মনে করছি কিছুদিন সব রকম লেখা থেকে ছুটি নিয়ে আরামে কেবল কষে বই পড়ব। আজ আমার এই সামনের জানালার ভিতর দিয়ে যে নির্মল প্রভাত উঁকি মারছে তার কী প্রসন্ন শ্রী — সে আর তোমাকে কী বলব। আমাদের দেশের শিশিরে ধোয়া একটি কোনো পৌষের সকাল আমার মনে পড়ছে। বড়ো ভালো লাগছে।”^৯

আরবানার গ্রীষ্মের বর্ণনার পাশে শীতের ছবিও রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন। সম্পূর্ণ বিপরীত সেই ছবি। তাঁর কলম তখন মুক্তধারা। মনের আবেগ কলমের ডগা দিয়ে চুঁইয়ে পড়েছে। ২৪এ পৌষ ১৩১৯এ জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি, “জানুয়ারির দুই তিন দিন থেকে বৃষ্টি বাদলার সূত্রপাত হয়েছে। সেদিন এক চোট বরফ পড়ে সমস্ত সাদা হয়ে গেল, তারপর সমস্ত রাত খুব কষে বৃষ্টি হোলো — একেবারে আমাদের দেশের বর্ষার ধারার মতো। সকালে দেখি সেই বৃষ্টি রাস্তার উপরে, গাছের উপরে, টেলিফোনের তারের উপরে জমে বরফ হয়ে গেছে। রাস্তা ভয়ংকর পিছল... পরের রাত্রি আবার বৃষ্টি। তার পরের দিন বরফের আবরণ আরো ঘন আরো কঠিন। গাছগুলো আগাগোড়া যেন কাঁচ দিয়ে মোড়া — বরফের ভারে মড়মড় শব্দে গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। — ইলেকট্রিক আলোর তারের উপর গাছ পড়ে রাত্রে তো সব আলো নিবে গেল। রাস্তায় পথিকের সংখ্যা অল্প, মোটর গাড়ির আশ্ফালন নেই বললেই হয় — আমি তো দু একদিন একেবারেই বেরইনি। অল্প বয়সে পদস্থলন হোলে লোকসান পূরণ হয়, আমার বয়সে সেটা সাংঘাতিক হবার কথা — এই জন্য পিছলের সম্ভাবনা দেখলে ঘরে বসে থাকাই আমার পক্ষে বুদ্ধির কাজ।।... আজ সকালে সূর্যোদয় হয়েছে। কী সুন্দর শোভা। শীতকালের পত্রহীন গাছের ডালগুলো একেবারে আগাগোড়া হীরের মতো ঝলমল করছে — যেন উৎসব বাড়িতে সারি সারি স্ফটিকের ঝাড় লাগিয়ে দিয়েছে। কাল রাস্তাগুলো আয়নার মতো স্বচ্ছ ছিল — রাত্রে তার উপর বরফ পড়ে সমস্ত শুভ্র হয়ে গেছে।... বরফের এ রকম কারিগরি এখানেও দৈবাৎ দেখা যায়।”^{১০} আরবানায় বরফপাতের বর্ণনা এবং বরফের ওপর হাঁটতে গিয়ে তাঁর কি দুর্দশা হয়েছিল তা মজার ভঙ্গিতে কন্যা মীরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: “একদিন বরফ পড়ে বেশ সাদা হয়ে গেল — তারপরে রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি [।] সকালে উঠে দেখি সেই রাস্তার উপরে গাছের উপরে একেবারে কাঁচের মত জমে গিয়েছে। রাস্তা এমন ভয়ানক পিছল যে তার উপর দিয়ে চলা শক্ত। দুদিন ধরে তাই ঘরে বন্ধ হয়ে আছি। আজ রোদ্দুর উঠে ভারি চমৎকার দেখতে হয়েছিলো। গাছপালা সমস্ত একেবারে হীরের মত ঝকঝক করছিল। বিকেলের দিকে আর থাকতে পারলুম না [।] ভাবলুম একবার একটুখানি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করে আসি। দু পা যেতেই বরফের

উপর এমনি পড়া পড়ে গেলুম যে কবিত্বসুন্দর কবি ভেঙে যাবার জো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসেছি।”^{১১} কিন্তু একথা ভাবলে ভুল হবে যে রবীন্দ্রনাথ কেবল আরবানার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবেগ তাড়িত ছিলেন। তাঁর সাংসারিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। এখানেও তার পরিচয় মেলে। ভারতবর্ষের মতো গৃহকর্ম করার লোক এখানে নেই। ফলে নিজের হাতে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করার বর্ণনা তিনি নানা চিঠিতে লিখেছেন। না, রবীন্দ্রনাথকে স্বহস্তে গৃহস্থালীর কাজ করতে হয় নি। ভার তুলে নিয়েছিলেন পুত্রবধূ এবং রথীন্দ্র-গৃহিণী প্রতিমা দেবী। তাতে রবীন্দ্রনাথ খানিক দুঃখ পেয়েছেন বইকি। জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক চিঠি: “আমাদের ছোটোখাটো ঘরকন্নার ভার বৌমাকে নিতে হয়েছে — আমরাও আজ পর্যন্ত হেল্প জেটাতে পারিনি। তাঁকে রাঁধতে, ঘর ঝাঁট দিতে, বিছানা তৈরি করতে হয় — অবকাশ মতো রথীকেও এসব কাজে যোগ দিতে হচ্ছে।”^{১২}

কিছুদিন পরে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। তখন কবি তাঁর কন্যা মীরা দেবীকে জানাচ্ছেন, “তোর বৌঠানকে এখন আর নিজের হাতে কাজ করতে হয় না। চাঁদ বলে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র আমাদের রঁধে দেয়, বজ্রিকম [চন্দ্র রায়] বাসন মাজা এবং ঘর ঝাঁটের কাজে নিযুক্ত [।] বৌমা কেবল বিছানা করেন। আর সোমেন্দ্র [চন্দ্র দেববর্মা] আহা করছে থাকে। এখানে ঘরকন্নার ব্যাপারটা তেমন অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয় — এখানে সমস্ত কাজই প্রায় কল টিপে চলে। বাজার করা টেলিফোনেই হয়ে যায়। দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেয় — এ দেশী রান্নায় বাটনা বাটা কোটনা কোটার জুলুম অতি যৎসামান্য — তারপরে গ্যাসে ইলেকট্রিসিটিতে মিলে রাঁধাবাড়া অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব এখানকার ঘরকন্নার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা মনে করিস নে। সেখানে আবার সেই ঝাঁট নিয়ে বসতে হবে — এবং মোচা ও থোড়ের মুণ্ডুপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে। এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই।”^{১৩}

আরবানা ক্লাস্ত-শ্রান্ত রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই প্রাণের শান্তি এবং মনের আরাম দিয়েছিল। কিন্তু কী এমন ঘটল যে ৫০৮ ডব্লু হাই স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে এক বছর পূর্ণ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে আরবানা ছেড়ে চলে এলেন? এর একাধিক কারণ সম্ভব। প্রথমত, রথীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, তাঁর পিএইচডি পড়াশোনার জন্যই তাঁরা সপরিবারে আরবানা এসেছিলেন। জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেও তার উল্লেখ আছে। কিন্তু “ইংলন্ড হয়ে দেশে ফেরার জন্য মন উৎসুক হয়ে উঠলে তিনিই রথীন্দ্রনাথকে লেখাপড়ার পাট গুটিয়ে ফেলার তাগিদ দিয়ে ২৪ Feb 1913 [১৬ ফাল্গুন] রোটেনস্টাইনকে লেখেন: “ ‘I have almost persuaded Rathi to wind up his affairs here and company me to England by the end of March or beginning of April.’ ”^{১৪} মীরা দেবীকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ একই কথা জানিয়েছেন।^{১৫} দ্বিতীয় কারণ রথীন্দ্রনাথের কাছেই জানা গেছে যা প্রথম কারণের বিস্তারিত রূপ, “আর্বানা হল যাকে বলে পাণ্ডববর্জিত দেশ — একপ্রকার মফস্বল বললেই হয়। এমন জায়গায় যে বাবা বেশিদিন সুস্থির হয়ে থাকবেন, সে রকম আশা করাটাই আমার ভুল হয়েছিল। তিনি যে হাঁফিয়ে উঠেছেন, তার পরিচিত লক্ষণ অচিরেই প্রকাশ পেতে লাগল।”^{১৬} তৃতীয় কারণ জানিয়েছেন রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমার, “রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে যে প্রবন্ধগুলি লিখে আরবানায় ও শিকাগোতে পাঠ করেছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট প্রশংসিত হলেও ঐ অঞ্চলের মানুষদের মনস্ত্বিতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন — বস্টন প্রভৃতি জায়গাকেই তিনি মনে করতেন ‘এদের দেশের মনের কারবারে প্রধান জায়গা’।”^{১৭} চতুর্থ কারণ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম কবির মনের সবটুকু অধিকার করেছিল। সেই বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা গিয়েছিলেন — একথা রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার এবং রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমার বারবার বলেছেন। কিন্তু আরবানা থেকে সেই অর্থ সংগ্রহের কোনো উপায় ছিল না।

সংবাদ ১ অক্টোবর ১৯১২এ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব দৈনিক Daily Illiniতে মুদ্রিত হয় :

Rabindra Nath Tagore, who is recognized as the foremost poet of India, is soon to pay the University a visit. The date for his visit has not yet been definitely learned but at present Mr. Tagore, his son, R.N. Tagore, and wife are in England where they are being entertained by English writers and artists.”^{১৮}

রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের অভিমত, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় কসমোপলিটান ক্লাবের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রথীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিকে এই সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন।^{১৯}

রবীন্দ্রনাথের আরাবানা আগমন সেখানকার ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের মধ্যে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। ফলে অবিলম্বে তিনি উয় অভ্যর্থনা পেলেন।^{২০} তাঁদের অন্যতম অধ্যাপক সেমুর যখন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির ভাষণের উদ্যোগ নিলেন তখন অবশ্য রথীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বাবামশায়ের নিভৃতবাসের শান্তি বিনষ্ট না করার জন্য সেমুর-পত্নীকে অনুরোধ করেন।^{২১} কিন্তু পরবর্তী দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে আরবানায় একাধিক বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেইসঙ্গে ‘গীতাঞ্জলি’ এবং ‘সাধনা’ থেকে নিজের লেখা পাঠ করে শোনাতে হয়েছে। নিজের কবিতাও পড়তে হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটারিয়ান চার্চের যাজক অ্যালবার্ট আর ভেল তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। যাজক (পাদ্রী) মহাশয় ইতিপূর্বেই ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের পরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছিল। তাছাড়া রথীন্দ্রনাথের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে যাজক মহাশয় তাঁর প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই সব কারণে ১০ নভেম্বর ১৯১২এ রবীন্দ্রনাথ ইউনিটারিয়ান চার্চে উপনিষদ সম্পর্কে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। পরে আরো তিনটি ভাষণ দিয়ে ১ ডিসেম্বর ১৯১২এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতামালা সমাপ্ত করেন। রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত উপনিষদের ব্যাখ্যান (‘সাধনা’) প্রসঙ্গা বহু বছর পরে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে সানন্দে উল্লেখ করেছেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ইমেরিটাস প্রফেসর এলারি পেন,

I met Tagore through a student of mine, and although it was forty-six years ago since I first heard him lecture here, I remember it very well. He was truly a great man.”^{২২}

আরো কেউ কেউ যেমন, স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীমতী এসথার জি হার্ডিং রবীন্দ্র-দর্শনের স্মৃতি স্মরণ করে বলেছেন,

I don't remember exactly what he said, but I do remember that he had an extremely handsome face — an enlightened face. He read poetry in his lectures. It was beautiful. He seemed to have spirit behind him. What impressed me was the beauty of his countenance and the dignity of his manners.”^{২৩}

ক্রমে দেখা গেল অধ্যাপক সেমুরকে কেন্দ্র করে আরবানায় রবীন্দ্র-অনুরাগীমণ্ডলী গড়ে উঠেছে যাঁদের মধ্যে ছিলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক এলারি পেন, সস্ত্রীক ফিজিক্সের অধ্যাপক জ্যাকব কুনজ, সস্ত্রীক অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক স্কট, শ্রী এবং শ্রীমতী ওয়ারেন ডে, শ্রীমতী বেসি স্মিথ প্রমুখ। ১৯১২-১৩র শীতের দিনগুলিতে অধ্যাপক সেমুরের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিক কবিতাপাঠ করলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সেমুরের ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীরা। শ্রীমতী বেসি স্মিথ সেই দিনগুলিতে ফিরে গিয়ে উচ্চারণ করেছেন,

It was quite thrilling. I've never forgotten it. He had the most beautiful eyes I've ever seen. The whole world seemed to be in his eyes.”^{২৪}

রবীন্দ্রনাথের গভীর অধ্যাত্ম জীবন এবং অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রতিচ্ছবি তাঁর দুই চোখে ধরা আছে — বেসি স্মিথ অনুভব করেছেন। আর অধ্যাপক এলারি পেনের অভিমতের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র-অনুরাগীবৃন্দের সম্মিলিত অভিব্যক্তির প্রকাশ —

He was gentle in spirit but forceful of ideas. When you heard Tagore speak it was no ordinary man. A handsome man, Tagore had a character different from any other man I ever met.”^{২৫}

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের আরবানা বাস শেষ হয়েছিল স্থানীয় কসমোপলিটান ক্লাবের বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে। তারিখ সম্ভবত ১৯ মার্চ। সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।^{২৬}

২০ মার্চ ১৯১৩এ আরাবানা ত্যাগ করার পরেও রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন তাঁর ভক্তদের মনে। তৈরি হলো টেগোরস্ ক্লাব। স্থির হলো মাসে একদিন কোনো একজনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ করা হবে। এই ক্লাবের সদস্যদের যখন ‘টেগোর সার্কেল’ নামে অন্যরা ডাকতেন তখন তাঁরা সানন্দে সেই উপাধি গ্রহণ করতেন।^{২৭}

১৯১৬এ রবীন্দ্রনাথ যখন আবার আমেরিকায় এলেন তখন টেগোরস্ ক্লাবের নির্ব্বাতিশয্যে ২২ ডিসেম্বর আরবানায় তাঁকে আসতে হয়েছিল। ১৩ জানুআরি ১৯১৭এ আসার কথা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পনা বদল করে আগেই আরবানা চলে এলেন। তাঁর আগমনবার্তা ১৯এ ডিসেম্বর Daily Illini পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। এবারে রবীন্দ্রনাথের একটিমাত্র বক্তৃতা দেবার কথা থাকলেও আরবানার মানুষের ভালোবাসার টানে অন্তত সাতটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

২৪ ডিসেম্বর ১৯১৬, রবীন্দ্রনাথ ‘পারসোনিয়ালিটি ইন আর্ট’ নিয়ে ইউনিটারিয়ান চার্চে বললেন। সেই রাতেই অধ্যাপক সেমুরের বাড়িতে টেগোর সার্কেলের সদস্যদের সামনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের বিষয় ছিল ‘ওয়াল্ড পারসোনিয়ালিটি’। পরেরদিন ‘সেকেন্ড বার্থ’ নিয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হলো। ২৭ ডিসেম্বর বিকেলে অধ্যাপক জ্যাকব কুঞ্জের বাড়িতে আয়োজিত বড়োদিনের অনুষ্ঠানে তিনি অপ্রকাশিত নাটক ‘সল্যাসী’ পাঠ করলেন। সেই রাতে স্থানীয় মরো হলে কবি তাঁর শিক্ষাচিন্তা এবং ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পরবর্তী শুরুরারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যতম প্রধান চিন্তা ‘ন্যাশনালিজম ইন দ্য ওয়েস্ট’ বিষয়ে বললেন। তারপর শনিবারে আরবানায় তাঁর এবারের শেষ ভাষণ ‘ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া’ শোনা গেল। না, এখানেই শেষ নয়। আরবানা ছেড়ে যাবার আগে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজারভেটরিতে গিয়ে প্রথমবার বিশাল টেলিস্কোপে আকাশভরা সূর্যতারা দেখলেন ‘বিশ্বপরিচয়’এর লেখক রবীন্দ্রনাথ। তারপর ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৬এ বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে আরবানা ছেড়ে তিনি চলে গেলেন শিকাগোয়।^{২৮}

আরবানার টেগোর সার্কেল ১৯২০ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। নতুন সদস্যরা সোৎসাহে যোগ দিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে নিয়মিত আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু ধীরেধীরে এর জীবনীশক্তি কমে এলো। তার অন্যতম কারণ — সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত অনেকেই ততদিনে আরবানা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন যাঁদের অন্যতম অধ্যাপক সেমুর। ১৯২৯-৩০এ রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকালের জন্য আমেরিকায় এলেও আরবানায় আর আসেন নি। তখন তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক বার্তা পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়ে দেবার জন্য বিশ্ব-পরিক্রমা করছেন। তবু তাঁর আরাবানা-বাসের শ্রুতি ফল কম ছিল না। তার উল্লেখ করে অধ্যাপক হ্যারল্ড এম হারউইটজ লিখেছেন,

It is also encouraging to note how easily men's minds can transcend national boundaries, for although few of Tagore's admirers in Champaign-Urbana had ever met an Indian before and fewer still had any of Indian thought or Indian philosophy, there were many who were immediately sympathetic to Tagore's ideas and appreciative of the beauty of his poetry and the nobility of his character. The admiration and love proffered to this Eastern poet in Illinois surely demonstrates the universality of human emotions and the similarity of men's longings. The enthusiastic welcome that Tagore received in Illinois was typical of the general American reaction to the Indian poet's... visits to the United States. In these dark days of inter-national tension and animosity, it is heartening to recall the love that went out in America to this gentle Indian pleading for international cooperation and understanding.^{২৯}

উদ্ভূতি দীর্ঘ হলেও রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে ঋদ্ধ আরবানার রবীন্দ্র-বন্ধুদের মনের ছবি এখানে পাওয়া গেছে যা কার্যত আবিষ্কারের মনের কথা।

৩

আরবানায় রবীন্দ্র-রচনা

আরবানায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ নিজের বিভিন্ন রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবং সেগুলিই হয়ে উঠেছে তাঁর ভাষণ। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে কবি জানিয়েছেন, “লন্ডনে আমার পদ্যের ধারা নিয়ে পড়েছিলাম [।] এখানে গদ্যের ধারা।... দ্বিতীয়বারে সমস্তটাই আমাকে লিখতে হয়েছিল।”^{৩০} অনুবাদে অগ্রসর হবার সময় প্রথমদিকে কবির কিছুটা জড়তা থাকলেও পরে তিনি সাবলীল হয়ে ওঠেন। নিজেই অজিতকুমার চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখেছেন, “এখানে আমাকে জবরদস্তি করে এই ইংরেজি গদ্য লেখায় প্রবৃত্ত করিয়ে আমার উপকার করেছে — ভয় ভাঙিয়েছে, কতকটা অভ্যাসও হয়ে আসছে।”^{৩১} ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটারিয়ান ক্লাবে তাঁর চারটি বক্তৃতা [‘বিশ্ববোধ’ (১০ নভেম্বর ১৯১২), ‘আত্মবোধ’ (১৭ নভেম্বর ১৯১২), ‘ব্রহ্মসাধন’ (১৭ নভেম্বর ১৯১২) ও কর্মযোগ’ (১ ডিসেম্বর ১৯১২)], শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে [‘Ideals of the Ancient Civilization of India’ (২৩ জানুয়ারি ১৯১৩)], ইউনিটারিয়ান হল ও আব্রাহাম লিঙ্কন সেন্টারে [‘The Problems of Evil’ (২৬ জানুয়ারি ১৯১৩)], রচেস্টার First Universalist Churchএ [‘Race Conflict’ (৩০ জানুয়ারি ১৯১৩)], হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমার্সন হলে [‘The Problems of Evil’ (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩)], ‘Man’s Relation to the Universe’ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩), ‘Realisation of Bramha’ (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৩) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এমার্সন হল, ফিলজফিক্যাল ক্লাব এবং ডিভিনিটি ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির শিরোনাম জানা যায় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রশান্তকুমার জানিয়েছেন, “এই সময়ে লেখা ‘The Problems of Self’ ও ‘Realisation of Bramha’ প্রবন্ধ-দুটি তিনি হার্ভার্ডে পাঠ করেন ও সেগুলি পরে Sadhana-য় প্রকাশিত হয়।”^{৩২} এই লেখাগুলি ছাড়াও ইতিপূর্বে রচিত কিছু লেখা রবীন্দ্রনাথ আরবানায় থাকাকালীন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন যা পরে ‘Sadhana : The Realisation of Life’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলির পশ্চাৎপট ব্যাখ্যা করেছেন করেছেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ, “বাবা তখন Sadhana নামে ইংরেজি বইয়ের প্রবন্ধগুলো লিখছেন। এক-একটা লেখা শেষ হয়, আর আমি তা টাইপ করতে দিই। কিন্তু ঘন ঘন সংশোধন-সংযোজনের ফলে দেখা গেল, লোক রেখে টাইপ করানো বেশ খরচসাপেক্ষ হচ্ছে। আমি তখন একটা ছোটোখাটো মেশিন কিনে নিজেই টাইপ করতে লাগলাম। এক-একটা লেখা কতবার যে টাইপ করতে হল তার ঠিক নেই। গোটা বইটা যখন টাইপ করা শেষ হল, ততক্ষণে বইটা আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।”^{৩৩} রথীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ নিজের বাংলা রচনাগুলিকে ইংরেজিতে নবরূপ দিতে কতখানি আগ্রহী ছিলেন।

কিন্তু কেবল গদ্য নয়, নিজের কবিতা ইংরেজিতেও রবীন্দ্রনাথ এইকালে অনুবাদ করেছেন যা কার্যত নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। সেকথা স্বীকার করে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে কবি চিঠিতে লেখেন, “যে সব কবিতা একবার লিখেছি তাকে আর এক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুব একটা রস পাওয়া যায়।”^{৩৪} কখনো বলেছেন, “আমি আরবানায় এসে সকালে গদ্য বক্তৃতা এবং বাকি দিনটা আমার কবিতার তর্জমা লিখে কাটিয়ে দিচ্ছি।”^{৩৫} রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর বাংলা কবিতাগুলিকে কেবল আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না — “আমি [বাংলা] কবিতার ভিতরের জিনিসটিকে ইংরেজিতে লেখবার চেষ্টা করি।”^{৩৬} রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন : “শ্রীমতী সেমুর ও শ্রীমতী মূড়ির সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আরও বহু কবিতা ও গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন — সেগুলি পরবর্তীকালে কৃত অনুবাদের সঙ্গে ক্রমে Fruit Gathering [1961], Lover’s Gift and Crossing [1918], The Fugitive [1921] প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও কিছু অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, বহু অনুবাদ এখনও অপ্রকাশিত।”^{৩৭}

এখানে বলা দরকার, আরবানা-বাসের সময় রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র বাংলা কবিতা লিখেছিলেন — “কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে? পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।”^{৩৮}

৪

শেষ প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ কি ১৯২১এর ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে তৃতীয়বার আরবানায় এসেছিলেন? এমন একটি বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গেছে অধ্যাপক হ্যারল্ড এম হারউইটজের লেখায়। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে লিখিত ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’ প্রবন্ধের শেষাংশে তাঁর বক্তব্য এমনই। প্রমাণ হিসাবে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গ্যারেটা বাসির স্মৃতিকথা উপস্থিত করেছেন। ১৯২১ সালে শ্রীমতী গ্যারেটা বাসি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, তাঁর পোশাক ও শারীরিক আকার প্রসঙ্গে তাঁর অনর্গল মন্তব্য,

He spoke some place on campus... I believe it was at the Wesley Foundation. His topic was "Indian Nationalism." He was beautiful to look at. Rather tall for an Indian. He had on sweeping robes. His voice was rather high, but very eloquent trustful of Oriental cults at that time, but he dispelled all cults.^{৩৯}

অধ্যাপিকা গ্যারেটা বাসি এখানেই থামতে পারতেন। কিন্তু থামেন নি। তিনি অধিকন্তু বলেছেন, “Here was a man at whose feet I could gladly sit.”

প্রশ্ন এটাই — হ্যারল্ড এম হারউইটজ প্রদত্ত ১৯২১এ আরবানায় রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়বার আগমনের দ্বিতীয় কোনো সাক্ষ্য নেই কেন? নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরে কবি তখন দেশেবিদেশে অতি বিখ্যাত এবং জনপ্রিয়। যে কোনো জায়গায় তাঁর আগমন বার্তা সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তাঁর গুণমুগ্ধরা তাঁকে বেষ্টন করে থাকেন। রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। অথচ রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার এবং রবি-জীবনীকার প্রশান্তকুমারের বিস্তৃত গবেষণাকর্মেও ১৯১৬এ আরবানায় রবীন্দ্র-পদার্পণ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। একমাত্র হ্যারল্ড এম হারউইটজ তাঁর প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখেছেন। তাহলে কি রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে হারউইটজ কিছুটা চমক সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন? তদনুযায়ী তাঁর মন্তব্য, “The Tagore Circle, in fact, had long since disbanded at the time the poet made his third and last visit to the Illinois campus in late February or early March, 1921. Many of its members did not even know that the poet was speaking on campus then, and the newspapers carried no reports of his address there.”^{৪০} তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এটাই — ভগ্নপ্রায় আরবানা রবীন্দ্র সার্কেলের কেউই কিছু জানলেন না, সংবাদপত্রে রবীন্দ্র-আগমনের কোনো খবর বেরোল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ আরবানায় এলেন, ভাষণ দিলেন এবং ফিরে গেলেন!!!

আসল কারণ এটাই — হারউইটজ তাঁর প্রবন্ধ লেখার সময় অধ্যাপিকা গ্যারেটা বাসির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। এবং সাক্ষাৎকার দেবার সময় অধ্যাপিকা বাসি সময়ের পারম্পর্য গুলিয়ে ফেলেছেন। ফলে ১৯১৬-১৭য় কবির দ্বিতীয় আরবানা ভ্রমণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯২১এ কবির তৃতীয় আরবানা সফর। ১৯১৬-১৭য় গ্যারেটা বাসি নিঃসন্দেহে তাঁকে আরবানায় দেখেছেন এবং তাঁর ভাষণ শুনেছেন যখন তিনি স্কুলের ছাত্রী। কিন্তু ৪৫ বছর পরে হারউইটজকে সাক্ষাৎকার দেবার সময় ১৯১৬র ৩০ ডিসেম্বর শনিবারে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ‘ন্যাশনালিজম্ ইন ইন্ডিয়া’ অধ্যাপিকা গ্যারেটা বাসির স্মৃতিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্’। এবং ১৯১৬ বদলে গিয়ে হয়েছে ১৯২১। বিপর্যস্ত স্মৃতি কোন্ বিভ্রমের সৃষ্টি করে, তার প্রমাণ এখানে আমরা পেলাম।

তবু একথা বলব যে ইলিনয়ের আরবানা রবীন্দ্র-জীবনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। এখানে না এলে তিনি হয়তো ঐশ্বর্যশালী আমেরিকার অন্যদিকের সঙ্গে পরিচিত হতেন না, যেখানে আছে শান্ত নিরুদ্ভিগ্ন চিন্তাশীল মানব সম্প্রদায় এবং অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রবীন্দ্র-স্বভাবে ‘হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন্খানে’

জড়িয়ে আছে। তারই টানে এক বছরের প্রতিশ্রুত আরবানা-বাস তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু ‘যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই’ এটা বলা যেতেই পারে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘রবিজীবনী’, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ আশ্বিন ১৪২১, পৃ. ৩৪৫। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ২০১৩র ২০ মার্চ আরবানা ত্যাগ করেন। তার উল্লেখ করে রবিজীবনীকার লিখেছেন, “আরবানা ত্যাগ করার সম্ভবত পূর্বদিন [৬ চৈত্র বুধবার ১৭ March] স্থানীয় কসমোপলিটান ক্লাবে তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।” (ওই, পৃ. ৩৭৩) (অতঃপর গ্রন্থটি ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’ নামে উল্লিখিত)
২. আরবানায় পদার্পণের পরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দফায় ঠিক কতদিন ছিলেন, তা জানিয়ে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, “আমেরিকায় এসে রবীন্দ্রনাথ আরবানা শহরের গৃহকোণটি আশ্রয় করে আড়াই মাস কাটিয়ে দেন।” ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৬১
৩. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS,’ Harold M. Hurwitz, published in ‘Indian Literature’, Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road, New Delhi 110 001, Vol. 4, 1961, p. 27 & 35 (Henceforth ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’)
৪. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৪৫
৫. জগদানন্দ রায়কে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রের পরবর্তী পড়াশোনার পুরো হিসেব জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে রিসার্চের কাজে রবীন্দ্রনাথ সফল হবার পরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কী পরিমাণ উপকার হবে তাও বলেছেন — “এদিককার পড়াশোনা সেরে রথীদের ফিরে যেতে যথেষ্ট দেরি হবার সম্ভাবনা আছে — হিসাব করে দেখা যাচ্ছে তিন বছর হবার কথা —... এখানে জুন পর্যন্ত Botany এবং Zoology-টার গোড়াপত্তন করে নিয়ে তারপরে ও কেমব্রিজে গিয়ে অধ্যয়নে যোগ দেবে। সেখানে research-এর কাজে অন্তত দু-বৎসর লাগবার কথা। এই research-এর চর্চায় পাকা হয়ে যেতে না পারলে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে কোনো কাজের মতো কাজ করতে পারবে না। আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে ও যদি বেশ রীতিমতোভাবে ল্যাবরেটরি খুলে রিসার্চে লেগে যেতে পারে তা হোলে আমাদের ছাত্রদের ভারি উপকার হবার কথা। তারা অনেকে এন্ট্রেন্স দিয়ে অন্যত্র না গিয়ে ওর সঙ্গেই কাজে লেগে যেতে পারবে।” (‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৭৮)
৬. ‘পিতৃস্মৃতি’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃ. ১৬০ (অতঃপর ‘পিতৃস্মৃতি’ নামে উল্লিখিত)
৭. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৪৫
৮. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘চিঠিপত্র ৫’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭, পৌষ ১৩৫২, পৃ. ১১-১২ (অতঃপর ‘চিঠিপত্র ৫’ নামে উল্লিখিত)
৯. সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘পথের সঙ্কয়’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা ৬, ভাদ্র ১৩৪৬, পরিশিষ্ট, পৃ. ৭৭ (অতঃপর ‘পথের সঙ্কয়’ নামে উল্লিখিত)
১০. জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠি, ‘পথের সঙ্কয়’, পৃ. ৮৫
১১. মীরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘চিঠিপত্র ৪’, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭, পৌষ ১৩৫০, পৃ. ৪৫ (অতঃপর ‘চিঠিপত্র ৪’ নামে উল্লিখিত)
১২. জগদানন্দ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘পথের সঙ্কয়’, পৃ. ৭৫-৭৬। আমেরিকায় কীভাবে গৃহস্থালী চলে তার বিবরণও জগদানন্দকে লেখা এই পত্রের প্রথমার্শে রয়েছে — “ইলিনয়ে এসে আমরা বাসা বেঁধে বসেছি। বাড়িটি বেশ ছোটোখাটো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা। এখানে দাসী চাকর পাওয়া যায় না — যারা ঘরের কাজ ক’রে দেয় তাদের হেল্প বলে। তারা ভৃত্য নয় — অনেক ভদ্র গৃহস্থের ছেলে মেয়েরা এই ক’রে খরচ চালিয়ে দেয়। এখানকার গৃহিণীদের অধিকাংশকেই রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয় —

রাঁধাবাড়া, ঘর সাফ করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ইত্যাদি। যে লোকদের এই রকম খাটতে হয় আমাদের দেশের সে শ্রেণীর মেয়েরা তার সিকি পরিমাণ কাজও করে না। এদের আবার আরও অনেক উপসর্গ আছে। কেবলমাত্র ঘর করনার কাজ ক’রে এলোমেলো হয়ে অস্তঃপুরে প্রচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটালে চলে না। তার উপরে পড়াশুনা, বক্তৃতা আদি শোনা এবং করা, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-অভ্যর্থনা করা, এবং সর্বদাই সুপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকা। আবার ছেলে মেয়েদের পড়ানোও অনেকটা পরিমাণে নিজেরাই করে। এখানকার অধ্যাপক সীমুরের বাড়িতে একজনও চাকর নেই। তাঁরা স্বামীস্ত্রী মিলে ঘরের সমস্ত ছোটোখাটো কাজ আদ্যোপান্ত নিজের হাতে করেন — তার উপরে মিসেস সীমুর বৌমাকে প্রত্যহ ইংরেজি শেখাবার ভার নিয়েছেন। যাঁকে অমন অশ্রান্ত খাটতে হয় তিনি যে কী ক’রে আবার এ রকম অনাবশ্যক দায়িত্ব কেবলমাত্র রথীর প্রতি স্নেহবশত গ্রহণ করতে পারেন আমি তো বুঝতে পারিনে।” (ওই, পৃ. ৭৫)

একই কথা সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও কবি জানিয়েছেন, “ওখানকার ঘরকরনার বিলি ব্যবস্থা সবই তো তুমি জানো। সেই আমেরিকান চালে আপাতত আমাদের জীবন যাত্রা আরম্ভ করা গেছে। অর্থাৎ ঘরে চাকর দাসী রাঁধুনি কেউই নেই, — আমাদের গৃহকর্ত্রীই [প্রতিমা দেবী] সমস্ত নির্বাহ করছেন। বৌমাই রাঁধেন, ঘর সাফ করেন। বজ্রিকম তাঁকে কতকটা সাহায্য করছে।] পরিবর্তে তার এখানে বিনামূল্যে আহার ও অবস্থান চলে যাচ্ছে। অবশ্য এখানে ঘরে বাইরে সকল প্রকার সুবিধা থাকাতে এ রকমটা সম্ভব হোতে পেরেছে। দেয়ালের গায়ে বোতাম টিপেই এখানকার প্রায় বারো আনা কাজ হোয়ে যায়।” (সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘পথের সঙ্কট’, পৃ. ৭৭)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠিতেও ওই কথাই পাওয়া গেছে: “আমরা একটা বাড়ি নিয়েছি — বৌমা তার গৃহিণীপনায় করেন — অর্থাৎ তাঁকেই রাঁধতে ঘর সাফ করতে হয় — এদেশে সবাই মনিব; চাকর পাওয়া প্রায় অসম্ভব বললেই হয় — অধিকাংশ ভদ্রগৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষ ঘরের প্রায় সমস্ত কাজ নিজের হাতে করেন। আজ দেখে এলুম বিকেলে এখানকার একজন বড় অধ্যাপক নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাপড় কাচছেন। নইলে উপায় নেই। এখানকার গরীব ছাত্ররা বেতন খোরাকির পরিবর্তে বাসনমাজা রাঁধা ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি ঘরের কাজ সেরে দেয়। আমাদের অনেক ভারতবর্ষীয় ছাত্র এ কাজে নিযুক্ত আছে। বৌমার এ একটা বেশ শিক্ষা হচ্ছে।” (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘চিঠিপত্র ৫’, পৃ. ১২) প্রসঙ্গাত জ্যোষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লেখা চিঠিতেও রবীন্দ্রনাথের একই অভিমত পাওয়া গেছে (‘চিঠিপত্র ৪’, পৃ. ৮-৯)

১৩. মীরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘চিঠিপত্র ৪’, পৃ. ৪৬

১৪. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৭৮

১৫. রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাঁর কন্যাকে লিখেছেন, “শীঘ্রই এখানকার লীলা সম্বরণ করতে হবে বলে রথী তার কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছে।” (মীরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘চিঠিপত্র ৪’, পৃ. ৫০)

১৬. ‘পিতৃস্মৃতি’, পৃ. ১৬১

১৭. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৬৬

১৮. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, p. 28

১৯. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৪৫

২০. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, p. 28

২১. রথীন্দ্রনাথ শ্রীমতী সেমুরকে চিঠিতে লেখেন, “It is very kind of Prof. Seymour to think of arranging for father to lecture at University. But father is very adverse to any sort of public life and am sure would not like to give any lectures while he is there. Moreover he is not used to speak in English.” (‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৪৫)। পিতৃদেবের ইংরেজি ভাষণের মান সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথের সন্দেহ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ভাষণ শোনার পরে আরবানার শ্রোতাদের অবশ্যই সেই সন্দেহ হয় নি। তেমনি একজন শ্রীমতী এলিজাবেথ হ্যাকলে (তৎকালে College of Liberal Arts and Science এর ছাত্রী) বলেছেন, p. 34 “His lecture was excellent and his English magnificent.” (‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, ইংরেজিতে ভাষণ দান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেই যে কতখানি সংকোচ ছিল এবং কীভাবে তিনি সেই সংকোচ কাটিয়ে উঠলেন তার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে দিয়েছেন।

তার মধ্যে গর্বের সুরও আছে, “আমেরিকায় এসে অবধি আমি অনেকদিন আর্বানা বলে একটি ছোট্ট সহরের এক কোণের ঘরে চুপচাপ করে পড়েছিলাম — কারো কাছে ধরা দিইনি। কিন্তু এ দেশের লোকের ভয়ানক বক্তৃতা শোনবার শখ। তাই এখানে এর আমাকে ক্রমাগত বক্তৃতা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। প্রথম প্রথম অবিচলিত ছিলাম — কেননা, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করতে গেলে কোনোমতেই নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারব না — সেই জন্যে চাণক্যের উপদেশ স্মরণ করে একেবারে মুখ বন্ধ করে সুগম্ভীর হয়ে বসে ছিলাম। অবশেষে আর্বানায় Unity Club বলে একটি ক্লাবে কিছু বলবার অনুরোধ এড়াতে পারা গেল না। ক্লাবটি ছোটখাট — তেমন দুর্ধর্য গোছের নয়, তার সভ্যসংখ্যা সামান্য [১] সেই জন্যে কোনোমতে রাজি হওয়া গেল। তার পরে একটা প্রবন্ধ লিখে সেখানে গিয়ে দেখি লোকে হল ভরে গিয়েছে — তখন পালাবার পথ বন্ধ। প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে সকলেই বাহবা দিতে লাগল। এতে আমার সাহস জন্মে গেল। একে একে পাঁচটা প্রবন্ধ তাদের সেই সভায় পাঠ করেছি। তারপর থেকে কেবলই বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্ছে। শিকাগো যুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করে আমার ভয় একেবারে ভেঙে গেছে। রচেষ্টার Religious Liberalsদের একটা বার্ষিক কনগ্রেস সভা ছিল [১] সেখানে মিনিট কুড়ি সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার ফরমাস পেয়েছিলাম। রচেষ্টার বস্টন সহরের কাছে। মনে করলাম যখন এতদূরেই আসা গেল তখন বস্টনটা সেরে নেওয়া যাক। বস্টনে এখানকার হার্ভার্ড যুনিভার্সিটি বলে সব চেয়ে বড় যুনিভার্সিটির স্থান। আপাতত এইখানে এসে পৌঁছন গেছে। কাল একটা বক্তৃতা দিয়েছি — আরো তিনটে দিতে হবে। তারপরে কোথায় যাব কি করব কিছুই ঠিকানা নেই।” (‘চিঠিপত্র ৪’, পৃ. ৫-৬)

২২. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, pp 29-30

২৩. Do, pp 30-31

২৪. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, p. 30

২৫. Do, p. 32

২৬. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৭৩। ২০ মার্চ ১৯১৩এ রবীন্দ্রনাথ যে সপরিবারে আরবানা ত্যাগ করবেন তা অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ১৮ মার্চের চিঠিতে লিখেছেন, “আমাদের এখানকার পালা শেষ হল, পশু চলে যাচ্ছি। এখানকার [বিশ্ব]বিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা পড়বার কথা ছিল কিন্তু তাহলে এ মাসটা এখানেই কাটাতে হয় — সে আমার ভাল লাগচে না। কেননা এখন চলবার মুখে দাঁড়িয়েছি।” (ওই)

২৭. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, p. 32

২৮. Do, pp 32-34

২৯. Do, pp 35-36

৩০. অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ‘পথের সঙ্কট’, পৃ. ৮২-৮৩

৩১. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৫০

৩২. ওই, পৃ. ৩৭১

৩৩. ‘পিতৃস্মৃতি’, পৃ. ১৬০

৩৪. ‘রবিজীবনী ষষ্ঠ খণ্ড’, পৃ. ৩৭১

৩৫. ওই

৩৬. ওই

৩৭. ওই, পৃ. ৩৫৪ এবং ৩৭২

৩৮. ওই, পৃ. ৩৫২

৩৯. ‘TAGORE IN URBANA, ILLINOIS’, pp 34-35

৪০. Do, pp 34

লেখক পরিচিতি: সুদীপ বসু, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং সাহিত্য সমালোচক।